রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ

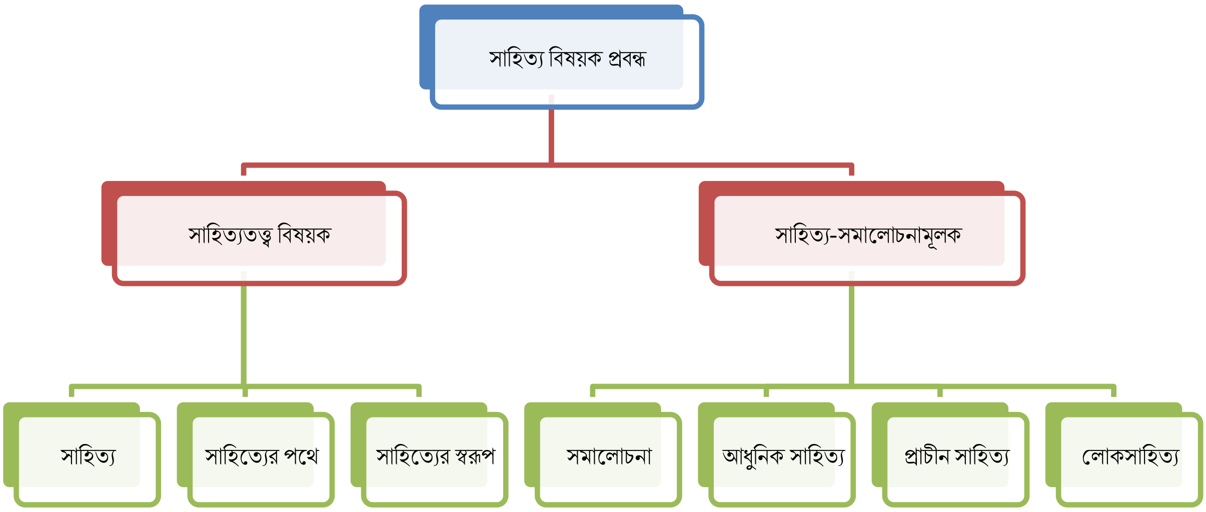

রবীন্দ্র সাহিত্যতত্ত্ব : কয়েকটি অভিমুখ

ক. সাহিত্যের উদ্দেশ্য : লোকহিতৈষা বনাম আনন্দ।

খ. কল্পনাতত্ত্ব : শুধুমাত্র Imagination নয়, এর সঙ্গে মিশে আছে অনুভূতি ও উপলব্ধির ব্যঞ্জনা।

গ. লীলাবাদ : খেলার থেকে স্বতন্ত্র, ঐশীভাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

ঘ. সাহিত্যের সত্য : বাস্তব থেকে স্বতন্ত্র।

ঙ. সৌন্দর্য সামঞ্জস্য ও আনন্দ : এই তিনটি বিষয়েই সাহিত্যের তাৎপর্য।

চ. সৃষ্টি ও অনুকরণ : নির্মাণ ও সৃষ্টির সম্পর্ক।

ছ. দুঃখবাদ : জীবনের ট্র্যাজেডি ও সাহিত্যের ট্র্যাজেডির—আনন্দ-দুঃখের সহাবস্থান

কাব্যের তাৎপর্য্য

প্রকাশ সংক্রান্ত তথ্য

প্রথম প্রকাশ : *সাধনা*, অগ্রহায়ণ ১৩০১।

পত্রিকা-প্রকাশের শিরোনাম "কাব্যের তাৎপর্য্য/ পাঞ্চভৌতিক সভায় আলোচিত"

মূল গ্রন্থ

পঞ্চভূত (১৮৯৭) শিরোনাম "কাব্যের তাৎপর্য্য"

পঞ্চভূত সম্পর্কে কিছু কথা

পঞ্চভূত বইটি প্রথাসিদ্ধ প্রবন্ধ-গ্রন্থের থেকে আঙ্গিকগত দিক থেকে অনেকটাই আলাদা। এখানে ছয়টি কল্পিত চরিত্র কোনো একটা বিষয়কে কেন্দ্রে রেখে নিজেদের মতামত জানিয়েছে। অর্থাৎ পলেমিক (Polemic=তার্কিক) এখানে রচনার শৈলি হিসেবে গৃহীত হয়েছে। পাঞ্চভৌতিক সভার পাঁচটি ভূত যথাক্রমে ক্ষিতি, অপ্ (স্রোতস্বিনী), তেজ (দীপ্তি), মরুৎ (সমীর), ব্যোম। এবং সভাপতি ভূতনাথবাবু। পঞ্চভূত বইয়ের লেখাগুলিতে উত্তমপুরুষ-বাচক সর্বনাম ('আমি') ব্যবহার করা হয়েছে ভূতনাথবাবু প্রসঙ্গে। সুতরাং ধরে নিতে হবে ভূতনাথবাবুর মতামত-ই রবীন্দ্রনাথের মত। যদিও এই *পঞ্চভূত*-এর বেশ কয়েকটি ভূতের সঙ্গে বাস্তব কয়েকটি চরিত্রের মিল খুঁজে পেয়েছেন অনেকেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই রচনাগুলির পূর্বসূত্র পাওয়া যায় ঠাকুরবাড়ির *পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক*-এ।

"কাব্যের তাৎপর্য্য" নিবন্ধের আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে রবীন্দ্রনাথে লেখা কাব্যনাটক *বিদায় অভিশাপ* (*সাধনা*, মাঘ ১৩০০)। যদিও আলোচনা শুধুই *বিদায় অভিশাপ*-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। কাব্যপাঠের কারণ বিষয়ে পাঞ্চভৌতিক সভার সদস্যরা নিজেদের বক্তব্য পেশ করেছেন।

পাঁচ সদস্যের মধ্যে এখানে তিন জনের মতামত পাওয়া যায়। ব্যোম, সমীর ও স্রোতস্বিনী। এছাড়া জানা যায় সভাপতি ভূতনাথবাবুর মতামত, যাকে স্রোতস্বিনী *বিদায় অভিশাপ*-এর স্রষ্টা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রায় কোনো মন্তব্য নেই দীপ্তি ও ক্ষিতির। কারণ *বিদায় অভিশাপ* দীপ্তির পছন্দ হয়নি, আর ক্ষিতি এখনো এই রচনার সঙ্গে পরিচিত নয়।

প্রবন্ধপাঠ

ব্যোমের ব্যাখ্যা

ব্যোম কচ ও দেবযানীর আখ্যানকে ভারতীয় আস্তিক্যবাদী দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখার চেষ্টা করে। আত্মা ও শরীরের প্রেক্ষিতে এই কাব্য-আখ্যানকে বিচার করে ব্যোম।

ক. পৃথিবীতে জীবের আগমণ স্বর্গ থেকে। মানবশরীরকে ব্যোম তুলনা করে আশ্রমকন্যার সঙ্গে।

খ. মানবশরীরেই মোহেই মানুষ মোহাবিষ্ট। তাকেই পরিতৃপ্ত করবার প্রয়াস।

গ. কিন্তু মানবশরীরের মধ্যেই মানুষ শেষপর্যন্ত পরিতৃপ্ত নয়। দেহধর্মের দ্বারা আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সম্ভব নয়। দুটি উদাহরণ ব্যোম ব্যবহার করেছে : ক. চোখের দ্বারা যে সৌন্দর্যবোধের জন্ম হয়, চোখ দিয়ে দেখেও মানুষ তৃপ্ত নয়। খ. শ্রবণের বোধ কানের মধ্যে দিয়ে মানুষ পায় কিন্তু পরক্ষণেই অতৃপ্তির জন্ম হয় : ‘সোই মধুর বোল শ্রুতিপথে শুনলুঁ, শ্রুতিপথে পরশ না গেল’

ঘ. তারপর একদিন দেহ ছেড়ে আত্মার অনন্ত যাত্রা, যেভাবে দেবযানীকে ছেড়ে কচ স্বর্গে ফিরে যায়। অথচ এই দেবযানীকে ঘিরেই হাজার বছর ধরে কচের আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত ছিলো। আত্মা ও দেহের বিছেদকেই ব্যোম এই বিশ্বচরাচরের প্রথম বিচ্ছেদ হিসেবে বর্ণনাকরে।

ঙ. সব শেষে ব্যোম কবিতাটিকে ডারউইনের বিবর্তনবাদের প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করেছে। সঞ্জিবনীবিদ্যাকে ব্যোম বেঁচে থাকবার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তুলনা করে ব্যোম।

সমীরের ব্যাখ্যা

সমীর বিষয়টির মধ্যে একটি সামাজিক তাৎপর্য খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে। সমীর স্বধর্মের প্রেক্ষিতে বিষয়টির ব্যাখ্যা করে বলতে চায়, সংসারের কাজের জন্য অনেক মায়ার বন্ধন ছাড়তে হয়, তেমনি কচকেও হয়েছে। এইসূত্রেই সমীরের ব্যাখ্যায় অভিশাপের প্রসঙ্গটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যিনি ভালো শিক্ষক তিনি হয়তো সাংসারিক প্রসঙ্গে অপটু, অর্থাৎ কাজের জগতের সঙ্গে ভাবনার জগতের ব্যবধানের কথাই এখানে মুখ্য। উদাহরণত প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে, ব্রানণের কাজ মন্ত্রণা দেওয়া, আর ক্ষত্রিয় বাজার কাজ সেই মন্ত্রণাকে কাজের জগতে বাস্তবায়িত করা। এই দুয়ের মিলল একই সঙ্গে সুলভ নয়। জ্ঞানলাভ ও অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ—দুটি স্বতন্ত্র বিষয়। কচও কেবল জ্ঞানলাভ করেছে, দেবযানীর অভিশাপে তার প্রয়োগের ক্ষমতা হারিয়েছে।

স্রোতস্বিনীর ব্যাখ্যা

ব্যোম ও সমীরের মতের সঙ্গে একমত হতে পারেনি স্রোতস্বিনী। কবিতার সামাজিক-দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যকে এড়িয়ে গিয়ে স্রোতস্বিনী জানায় কবিতার কাজ মানব জীবনের অত্যন্ত সাধারণ সুখ দুঃখ আবেক অনুভূতিকে নিজের মধ্যে ধারণ করা। সেই অনুভূতি সাধারণ কিন্তু চিরন্তন, অতি প্রাচীন কিন্তু চির নবীন, শাশ্বত। সে উদাহরণ হিসেবে শকুন্তলার করুণ আখ্যান বা মহাভারতের সভাপর্বের দ্রৌপদীর আর্তনাদের কথা উল্লেখ করেন। এই দুই কাহিনীর যে তাৎপর্যই পণ্ডিত বার করুন না কেন প্রাথমকভাবে পাঠককে এই কাহিনী মুগ্ধ করে এর স্বাভাবিক দুঃখজনক পরিণতি ও পারিপার্শ্বিকের আততি। কচ ও দেবযানীর আখ্যানেও স্রোতস্বিনী তাই খুঁজেছে মানব-মানবীর চিরন্তন বিরহের বোধ। স্রোতস্বিনী তাই বিনীত অথচ দৃঢ়ভাবে জানায়, এই চিরন্তন বিরহের বোধকে প্রাধান্য না দিয়ে যাঁরা কবিতার গূঢ়-জটিল তাৎপর্য খুঁজতে চায় তাঁরা কখনোই যথার্থ কাব্যরসিক নন।

ভূতনাথবাবুর মত

স্রোতস্বিনীর মত ভূতনাথবাবু সমর্থন করেন। তিনিও মনে করেন কাব্যের সহযাত অর্থের মধ্যেই কাব্যের প্রকৃত তাৎপর্য নিহিত আছে। তাকে অকারণ জটিল করবার কোনো মানেই নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এও স্বীকার করেন যে প্রকৃত কাব্য পাঠকের কল্পনাশক্তিকে জাগিয়ে তোলে। এইভাবেই একটা কাব্য পাঠকের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন তাৎপর্য লাভ করতে পারে। স্রষ্টা হিসেবে কোনো ব্যাখ্যাকেই তিনি ব্যক্তিগতভাবে নাকচ করতে চান না।

আধুনিক কালের পাঠক প্রতিক্রিয়াবাদ এই মতকেই সমর্থন করে। কোনো টেক্সটের একটিই বিশেষ তাৎপর্য হতে পারে না, টেক্সট স্বভাবগুই অনেকান্ত তাৎপর্য বহন করে, পাঠক-সমালোচকের ব্যাখ্যায় যুগে যুগে সেই নতুন তাৎপর্য ধরা পড়ে।

সম্ভাব্য প্রশ্ন

২-নম্বরের জন্য

১. প্রকাশ সংক্রান্ত তথ্য

২. স্রোতস্বিনী ভারতীয় পুরাণের কোন কোন নারীর কথা উল্লেখ করেছেন?

৩. কাব্যের তাৎপর্য রচনাটির পশ্চাদপটে কোন কাব্যনাটকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে? তার প্রকাশ সংক্রান্ত তথ্য

৪-নম্বরের জন্য

১. ব্যোম, সমীর, স্রোতস্বিনী ভূতনাথবাবুর আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা

৮-নম্বরের জন্য

১. মূল বিষয়বস্তু

২. স্রোতস্বিনী ভূতনাথবাবুর মতামত।

সাহিত্যের তাৎপর্য

প্রথম প্রকাশ : নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, অগ্র. ১৩১০

মূল গ্রন্থ : সাহিত্য (১৯০৮)

বিষয়বস্তু

সাহিত্যের তাৎপর্য নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আসলে আলোচনা করেছেন সাহিত্যের উপাদান ও পটভূমি বিষয়ে। মানব হৃদয় ও মানব চরিত্র এই দুটি সাহিত্যের বিষয়। রবীন্দ্রনাথ এখানে মানভহৃদয়কেই মূল উপাদান বলতে চান কারণ মানবচরিত্রও মানবহৃদয়ের মাধ্যমেই সাহিত্যে রূপায়িত হয়।

বাইরের জগৎ আমাদের মনের জগতের সঙ্গে মিশে নতুন একটা জগৎ সৃষ্টি করে। এই মনের জগৎ বাইরের জগতের হুবহু অনুকৃতি নয়। কারণ এই জগতে মিশে থাকে ব্যক্তিহৃদয়ের বিচিত্র ভাব। হৃদয়বৃত্তির সূত্রেই বাইরের জগৎ বিশেষরূপে আপনার হয়ে ওঠে। বলাই বাহুল্য, মনের এই জগৎ ব্যক্তিভেদে স্বতন্ত্র! বাইরের কোনো বিশেষ কোনো ঘটনা এক ব্যক্তির হৃদয়বৃত্তিকে প্রবল আলোড়িত করতে পারে, আবার সেই ঘটনাই অপর কাউকে হয়তো সামান্যও বিচলিত করে না। হৃদয়ের এই জগৎ একজনের থেকে অন্য জন বিচ্ছিন্ন, কিন্তু দূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানবহৃদয়বৃত্তির এক অনবচ্ছিন্ন প্রবাহ চলছে। সনাতন এই প্রবাহ সুপ্রাচীন কিন্তু চিরনবীন। এই জগৎ প্রকাশোন্মুখ কিন্তু সবাই তা প্রকাশ করতে পারে না।

হৃদয়বৃত্তির প্রকাশিত রূপটিই সাহিত্যের জগৎ। আমাদের মানস-জগৎ বা হৃদয়বৃত্তির ভুবন নতুন এক রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয় সাহিত্যের জগতে। এক কথায় বাস্তব জগৎ থেকে হৃদয়বৃত্তির জগৎ এবং হৃদয়বৃত্তির জগকেই মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ সাহিহিত্যের জগতের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাই প্রথমত গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় :

ক. ব্যক্তির (সাহিত্যিকের) হৃদয় বাস্তব জগতের কতখানি বস্তু ধারণ করতে পারে। এই ধারণ ক্ষমতার ওপর রচনার গভীরতা নির্ভর করে।

খ. হৃদয়বৃত্তির সেই জগৎকে ব্যক্তি (সাহিত্যিক) কতখানি প্রকাশ করতে পারলেন। এক্ষেত্রে জরুরি হয়ে ওঠে রচনাশক্তির নৈপুণ্য।

রবীন্দ্রনাথের মতে যে ব্যক্তির (সাহিত্যিকের) ক্ষেত্রে এই দুটি বিষয়ের সামঞ্জস্য ঘটে 'সেখানেই সোনায় সোহাগা'।

হৃদয়বৃত্তিকে অধিক গুরুত্ব দিয়েও রবীন্দ্রনাথ রচনাশক্তির নৈপুণ্যকে মহামূল্যবান বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। কারণ রচনাশক্তিরই পাথেয়, যার ওপর ভর করে মানবমনের ভাব প্রকাশিত হয়। এবং এই দুই বিষয় একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। প্রাবন্ধিক এখানে রচনাশক্তির বিকাশের প্রসঙ্গেও কথা বলেছেন। তাঁর মতে এই ক্ষমতা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে সঞ্চিত হতে থাকে, এবং তা ভাবীকালের সাহিত্যিকের সহায় হয়ে ওঠে।

এরপর রবীন্দ্রনাথ কথা বলেছেন প্রকাশ ভঙ্গি নিয়ে। তাঁর মতে সেইভাবেই প্রকাশ করা জরুরি যাতে পাঠকহৃদয়েও ভাবের উদ্রেক হয়। বিষয়টি বোঝানোর জন্য লেখক পুরুষ ও নারীর তুলনা করেছেন। লেখকের মতে নারীর কাজ যেহেতু হৃদয় সংক্রান্ত তাই তাকে পুরুষের মতো ছিমছাম হলে চলে না, তাকে সুন্দর হতে হয়। নিতান্ত সোসাসুজি সুস্পষ্ট হলে চলে না আভাস-ইঙ্গিত থাকা চাই। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাই ছন্দ-অলংকার-আভাস-ইঙ্গিত দরকার, বিজ্ঞান-দর্শনের মতো নিরাভরণ হলে চলে না। সেই সঙ্গে এটাও স্বীকার করেন, কেবল অলংকার আচ্ছাদিত হলেই চলবে না, তার মধ্যে অনির্বচনীয়তা রক্ষা করা হরুরি। অর্থাৎ রূপের মধ্যে দিয়েই রূপাতীতকে ধরবার চেষ্টা, ভাষার মধ্যে দিয়েই ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠা দেবার প্রয়াস। এই অনির্বচনীয়তা, ভাষাতীতকে প্রকাশ করার জন্য লেখক দুটি বিষয়ে আশ্র্য নেন : চিত্র ও সংগীত।

ক. চিত্র : অর্থাৎ ভাষার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিতব্য ভাবের ছবি আঁকা। এককথায় চিত্রই স্রষ্টাহৃদয়ের বিমূর্ত ভাবকে আকার দেয়।

খ. সংগীত : বাক্যবিন্যাসের (diction) মাধ্যমে একটা অন্তর্লীন সংগীতের প্রবাহ সৃষ্টি করা। এই সংগীত ভাবকে গতিপ্রদান করে।

মানবহৃহয় নিয়ে এই আলোচনার শেষে লেখ উল্লেখ করেছেন মানব চরিত্রের কথা। মানবহৃদয়ের মানব চরিত্রও অত্যন্ত জটিল একটি অনুষঙ্গ, সাহিত্য যাকে নিজের শরীরে ধারণ করতে চায়। তা চিরচঞ্চল, অস্থির ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের বহিঃপ্রকৃতি ও মানবচরিত্র মানবহৃদয়ে যে রূপ লাভ করে, চিত্র ও সংগীতের মাধ্যমে তার প্রকাশই সাহিত্য।

সব শেষে আস্তিক রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের সঙ্গে বিষয়টি তুলনা করেছেন। ঈশ্বর যেমন মানবচরিত্রের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে, মানবহৃদয়ও তেমনি নিজেকে সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে চায়। ঈশ্বরের আনন্দের প্রকাশ যেহেতু হৃদয়ের আনন্দধ্বনি, তাই সাহিত্যস্রষ্টার আনন্দের প্রকাশ যে সাহিত্য, তা আসলে ঐশ্বরিক আনন্দধ্বনিরই প্রসারমাত্র। তাই সাহিত্য আসলে ব্যক্তিবিশেষের নয়, আসলে তা দৈববাণী। মনে রাখতে হবে জীবনের এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ কঠোর আস্তিক। *নৈবেদ্য* পেরিয়ে তিনি চলেছেন *খেয়া*-র দিকে। তাছাড়া তাঁর জীবনদেবতা তত্ত্বের প্রেক্ষিতেও বিষয়টির বিচার সম্ভব।

সম্ভাব্য প্রশ্ন

২-নম্বরের জন্য

১. প্রকাশ সংক্রান্ত তথ্য

৪-নম্বরের জন্য

১. চিত্র ও সংগীত প্রসঙ্গে আলোচনা

২. দৈববাণীর প্রসঙ্গ

৮-নম্বরের জন্য

১. মূল বিষয়বস্তু